# যৌনতা ও নিপীড়ন : ব্যক্তিগত বয়ান

নভেরা হোসেন

যৌনতা এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি নারী-পুরুষের জীবনের প্রায় অপরিহার্য একটি ভ্রমণ। মানবদেহ মাতৃগর্ভে বিকশিত হওয়ার মুহূর্তগুলোতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর সঙ্গে সঙ্গে যৌনাঙ্গ তৈরি হয় নারী ও পুরুষ ভ্রূণে। একটু একটু করে মায়ের জঠরে বেড়ে ওঠা মানবশিশু পূর্ণাঙ্গ বিকশিত হয়ে পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলে। এই যে প্রবহমান জীবন, এর রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস।

নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের হোমোসেপিয়েন্স এবং এটা শুধু শরীরী বিষয় নয়। মানবজাতি আজকের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছে সংস্কৃতি নামক একটি মিশ্র প্রপঞ্চ। সারা পৃথিবীতে মানুষ ছড়িয়ে আছে শত শত গোত্র, জাতি, সম্প্রদায়ে বিভাজিত হয়ে। বর্ণ, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক অবয়ব, ভূখণ্ড সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। মূলত ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক অবয়বের ভিত্তিতে জাতি তৈরি হয়েছে। ধর্মও সম্প্রদায় তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। সংস্কৃতি নিয়ে কথা বলার মূল উদ্দেশ্য নারী-পুরুষ সম্পর্ক, তাদের পারিবারিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও যৌন জীবনযাপন সব কিছুই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রবাহিত। তবে ব্যতিক্রম নানা বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় এসব সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

আমার এ লেখার বিষয়বস্তু যৌনতা সম্পর্কে ধারণা এবং যৌনতা বিষয়ক নানা নিপীড়নমূলক আচরণ নিয়ে। নারী-পুরুষ প্রাকৃতিকভাবে যেমন যৌন আকর্ষণ বোধ করে পরস্পরের প্রতি, তেমনি সাংস্কৃতিক নানা চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধও তার মধ্যে এ ধরনের অনুভূতি তৈরি করতে ক্রীড়নক হিসেবে ভূমিকা রাখে; যেমন বাঙালি সমাজে পারিবারিক প্রথায় বিয়ের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। একজন ছেলে বা মেয়ে তার শৈশব থেকেই জেনে বড় হয় যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার বিয়ে হবে অপর লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে এবং তা জানাশোনার বাইরে হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে একজন অপরিচিত নারী বা পুরুষের প্রতি কেবল দীর্ঘকালব্যাপী লালন করা কামনার বশে একদিনের পরিচয়েই বিবাহিত নারী-পুরুষ যৌন সম্পর্কে মিলিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ঘটতে সাধারণত তেমন কোনো মানসিক সমস্যা হয় না দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। এর কারণ, বাঙালি সমাজে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির সঙ্গে যৌনতায় জড়িত হওয়ার বিষয়টি ছেলেমেয়ে উভয়কে শৈশব থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। অথবা পরিবার ও সমাজের সদস্যরা এ বিষয়ে সে ধরনের মনোভাব পোষণ করে, কথা বলে থাকে। অন্যান্য সদস্যরা সেটি সামাজিকীকরণের মাধ্যমে গ্রহণ করে। এমনকি আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন রয়েছে। একজন দশ-বারো বছরের মেয়েকে পনেরো-ষোলো বছরের ছেলের সঙ্গে পরিবারিকভাবে বিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের পৃথক ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিশোর অবস্থায়ই ছেলেমেয়েরা যৌন সম্পর্কে মিলিত হয়। এটা

প্রথম প্রথম তাদের জন্য কষ্টকর এবং ভয়ের বিষয় হলেও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণে ছেলেমেয়েরা সম্পর্কটিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করে।

আমাদের ঢাকার মিরপুরের বাসায় বেশ কিছু অল্পবয়সী মেয়ে সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। তাদের বেশিরভাগের বিয়ের অভিজ্ঞতা হয় তাদের বয়স পনেরো-ষোলো হবার আগেই। তারা বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় এবং বিয়ের দু-এক বছরের মধ্যেই সন্তান প্রসব করে। এ ক্ষেত্রে যৌনতার অনুশীলন যতটা না হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তরাধিকার তৈরির শরীরী বিষয়টি কাজ করে। যৌনতা শুধু উত্তরাধিকার তৈরির একটি প্রক্রিয়া নয়। এর মাধ্যমে নারী-পুরুষ পরস্পরের মানসিক ও শরীরিক সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে আনন্দ পেয়ে থাকে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু সংস্কৃতিভেদে দেখা যায়, যৌনতা কোথাও কোথাও শুধু শারীরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের শহুরে মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে বাইরের পরিবেশে বহু নারী-পুরুষের সংস্পর্শে আসার পর অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত হবার এবং মেলামেশার সুযোগ পায়। এ ক্ষেত্রে সঙ্গী নির্বাচন করতে সক্ষম হয় তারা। তবে অনেক ক্ষেত্রে শহুরে পরিবারগুলোতেও অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ ঘটে থাকে। সে ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পরস্পরকে জানাশোনার আগেই যৌন সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে বাধ্য হয়। পশ্চিমা বহু দেশে নারী ও পুরুষরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদিতার চর্চা করে থাকে। তারা এমনকি বিয়ের পূর্বেই বহু বছর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে থাকে এবং যৌন সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। যদি একসঙ্গে থাকতে তাদের ভালো লাগে, মতের মিল হয়, রুচি ও সংস্কৃতির মিল ঘটে, তাহলে পরে তারা দীর্ঘস্থায়ী বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। বর্তমানে বিশ্বে তালাকের হারও বেড়ে গেছে। এ থেকে বোঝা যায় পূর্বের পুরোনো ধ্যান-ধারণা এখন আর তেমন কাজ করছে না, লিভিং টুগেদার বা নারী-পুরুষ বিয়ে ছাড়াই একত্রে বসবাস করছে। পশ্চিমাসহ পৃথিবীর বহু দেশে এর অনুশীলন দেখা যায়। আমাদের দেশেও ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বিয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত না হয়ে বহু নারী-পুরুষ একত্রে বসবাস করছে। তবে দেশীয় প্রচলিত চিন্তা-ভাবনায় তারা এখনো গ্রহণযোগ্য নয়।

যৌনতা এবং যৌন নিপীড়ন, সহিংসতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মূল কারণ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে নারী-পুরুষের যৌথ ও যৌনজীবনের একমাত্র স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে বিয়ে। তবে এর বাইরেও অর্থের বিনিময়ে যৌন সম্পর্ক করার একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারীরা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিয়ে এবং স্বীকৃতি ছাড়াও এ পেশায় নিয়োজিত আছেন। পুরুষরাও অনেকে এ পেশা বেছে নেন। সমকামিতাও যৌন সম্পর্কের আরেকটি রূপ। পুরুষেরা সম্পর্কের ভিত্তিতে বা অর্থের বিনিময়ে অন্য একজন পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়। তবে সমকামিতার বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেও সমাজে ঘটে থাকে। পশ্চিমা দেশগুলোতে সমকামীদের বিয়েও স্বীকৃতি পাচ্ছে ধীরে ধীরে। এরকম অনুশীলন এ দেশে কম। সামাজিক-ধর্মীয় বিষয়গুলো এ ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করে।

## শৈশবের যৌন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা

এ লেখায় একটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। যৌন নিগ্রহ, সহিংসতা নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। আমি একজন নারী বলে নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। তবে আমাদের বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনদের কাছ থেকে ছেলেশিশু বা কিশোর বালকদের বিষয়েও অনেক কিছু শুনেছি। আমার এক লেখকবন্ধুর দুই ছেলে। ছোট ছেলে মানসিকভাবে কিছুটা বিশেষ ধরনের ছিল ছোটবেলায়। তার দেখাশোনা করত যে মেয়েটি সে শিশুটিকে ছাদে নিয়ে গিয়ে তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করত এবং আরও কিছু ঘটাত। বাচ্চাটি একপর্যায়ে এ বিষয়টি বাবা-মায়ের কাছে বলে দিলে তারা জানতে পারে। ওই ঘটনা শিশুটির মনে গভীর প্রভাব ফেলে। সেজন্য সে কিছুটা ব্যতিক্রম ধরনের ব্যবহার করত। শৈশবেই বাচ্চাটির মনে ও দেহে যৌন আচরণের প্রভাব পড়ায় তা তার মানসিক গঠনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। কিছুটা বড় হওয়ার পর স্বাভাবিক স্কুলে পড়াশোনা করতে তার সমস্যা হয় এবং দীর্ঘদিন চিকিৎসা ও কাউন্সিলিং করানোর পর ছেলেটি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে। এই ঘটনা থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্টভাবে উঠে আসে, তা হচ্ছে আমরা যাদের একজন শিশুর লালনপালনকারী ভাবি এবং যার সঙ্গে শিশু দীর্ঘসময় কাটায় তারাও অনেক ক্ষেত্রে শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে নানা ধরনের মানসিক ও শারীরিক সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করে, যা সেই শিশু বা কিশোর-কিশোরীর জীবনে মারাত্মক ক্ষতি ঘটিয়ে ফেলে।

পৃথিবীর সব সমাজেই নানা ধরনের মানসিক গঠনের মানুষ বসবাস করে। তাদের কাঙ্ক্ষিত যৌন চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তারা বিচিত্র পথে যৌনতার স্বাদ পেতে চায়। অনেক ক্ষেত্রেই বিকৃত এবং অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় দেয়। সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ও ছেলেশিশু ধর্ষণ অথবা যৌন নিপীড়নের সম্মুখীন হয় তা ভয়াবহ। এ ক্ষেত্রে দুটো বিষয় মূলত কাজ করে। প্রথমত অসুস্থ, বিকৃত, যৌনচাহিদা পূরণে ব্যর্থ নারী ও পুরুষেরা বিপরীত লিঙ্গের অপ্রাপ্তবয়স্কদের বেছে নেয়। জোর-জবরদস্তি করে অথবা ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে যৌন নিগ্রহ ঘটিয়ে থাকে। এটা যে সব সময় ধর্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। যৌন নিগ্রহের পর সেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের মেরে ফেলা হয় পর্যন্ত। আবার অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় ধরে একটু একটু স্পর্শ, সুযোগ বুঝে যৌনাঙ্গ ব্যবহার, চোখ দিয়ে নানারকম আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও চলতে থাকে ধারাবাহিক অত্যাচার।

আমাদের বাসায় একসময় বেশ অল্পবয়সী এক মেয়ে গার্হস্থ্যকর্মে সহকারী হিসেবে কাজ করত। আমার আম্মা তখন স্কুলে চাকরি করত। বাবা-মা দুজনেই অফিসে চলে যেত। সে সময়ে আমাদের এক আত্মীয় প্রায়ই হল থেকে আমাদের বাসায় আসত। আমি তখনো স্কুলে যাওয়া শুরু করি নি। ঘরে আমার ছোট ভাইও ছিল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর সেই আত্মীয়টি আমাদের চোখের সামনেই জোর করে সহকারী মেয়েটিকে একটি ঘরে নিয়ে আটকিয়ে যৌন নিপীড়ন চালাত। একদিন মেয়েটির কান্নার শব্দে আমি দৌড়ে ওই ঘরে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে যায়। দেখতে পাই আমার পুরুষ আত্মীয়টি ওই কিশোরী মেয়েটির শরীরের

ওপর দানবের মতো ঢেকে বসে আছে আর মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদছে। এই ঘটনা আমার মা বা অন্য কেউ জানত না বা বুঝতে পারে নি। মেয়েটিও আমার আম্মাকে কিছু বলে নি। আমি তখন এতটাই ছোট ছিলাম যে এ বিষয়ে কী বলতে হয় তাও জানা ছিল না। আর ওই বয়সে কেন তারপরেও অনেকটা পরিণত বয়সেও এ বিষয়ক কোনো অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষের সঙ্গেই ভাগ করে নিতাম। আমাদের সমাজের ধারণাটাই এমন যে যৌন হয়রানিমূলক কোনো কথা কারো কাছে প্রকাশ না করাটাই ভালো। এতে নিজের গ্লানি ও কষ্ট আরও বেড়ে যায়। কেননা অভিভাবক বা বন্ধুস্থানীয় বেশিরভাগ মানুষই এ ক্ষেত্রে প্রথমেই অভিযোগকারীর দিকে আঙুল উঁচু করে তাকেই নানাভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করে। একেকটা সমাজের রীতিনীতি একেক রকম হলেও যৌন হয়রানির বিষয়ে বিশ্বের বেশিরভাগ সংস্কৃতি একই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে থাকে।

আমার জন্ম যদিও মাদারীপুর জেলা শহরে নানাবাড়িতে কিন্তু বেড়ে উঠেছি ঢাকা শহরে। বাবা-মায়ের কর্মসূত্রে ঢাকার রায়ের বাজারে শুরু হয় আমার শৈশব জীবন। শৈশবের স্মৃতি খুব স্পষ্ট করে কারো মনে থাকে না কিন্তু যদি কোনো ঘটনা শরীর ও মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে, তাহলে সেটা শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং সারাজীবন সে অনুভূতি মনে রয়ে যায়। অল্পবয়সে আমি খুব নানাবাড়ি বেড়াতে যেতাম। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে দীর্ঘ একমাস সেখানে কাটাতাম। নানা একজন আইনজীবী ছিলেন। তাঁরা সচ্ছল ছিলেন কিন্তু বাড়িতে তখনো টেলিভিশন ছিল না। সুতরাং খালাদের সঙ্গে আমরা পার্শ্ববর্তী এক নানার বাড়িতে টেলিভিশন দেখতে যেতাম। আশির দশকে মফস্বল শহরের বাড়িগুলোতে টেলিভিশন তেমন ছিল না। বহু লোক ওই বাড়িতে আসত সাপ্তাহিক নাটক ও খবর দেখতে। আমি গিয়ে বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার মামার এক বন্ধু তার কোলে বসতে অনুরোধ করে। তখন সবে নয়-দশ বছর, স্বচ্ছন্দে মামার কোলে বসে টেলিভিশন দেখতে থাকি। ওই সময় ঘরের বাতি বন্ধ থাকত। তন্ময় হয়ে টেলিভিশন দেখার সময় টের পাই ওই মামা আমার উরুতে চাপ দিচ্ছেন এবং তার হাত জামার উপর দিয়ে আমার স্তন স্পর্শ করছে। চরম অস্বস্তি নিয়ে দু-একবার উঠে দাঁড়াই। মামা বলে, কী হয়েছে? বসো! কোলে বসতে খারাপ লাগছে? অল্পবয়সে যেটা হয়, ওই পরিস্থিতি থেকে চলে যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা থাকে না এবং লজ্জা ও ভয় একত্রে কাজ করতে থাকে। গুটিশুটি হয়ে আবার মামার কোলে বসি। উনি জিজ্ঞেস করেন তুমি জিন্সের প্যান্ট পরেছ? আমি 'হ্যাঁ'সূচক মাথা নাড়ি। এরপর আরো যতক্ষণ ওখানে থাকি, উনি ক্রমাগত নিম্নাঙ্গে স্পর্শ করতে থাকেন এবং আঙুল দিয়ে চাপ দিতে থাকেন। একপর্যায়ে বাথরুমে যাবার নাম করে নানার বাসায় ফিরে আসি। এরকম ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। কিশোর মনে এই ঘটনা সম্পর্কে প্রথমত দারুণ ভয় ও লজ্জা কাজ করতে থাকে। কাউকে বলতে পারি না। খালাদের বলার কথা ভাবি কিন্তু কেন যেন বলতে পারি না। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোথাও যৌনতা কী এবং যৌননিপীড়ন কী সে সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা দেয়

নি শিশু-কিশোরদের। সে কারণে শৈশবে যৌনতা ও তার অপব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা হয় নি। অল্পবয়সে এ ধরনের স্পর্শের ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে কখনো রিকশায় একা ফিরতাম। তখন রিকশাওয়ালা হুট লাগাতে গিয়ে স্তন ও উরুতে স্পর্শ করত এবং যতক্ষণ রিকশায় থাকতাম বারবার এমন এক লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত যে মনে হতো দৌড়ে রিকশা থেকে নেমে যাই। অথবা অসম্ভব কান্না পেত, কিন্তু চোখ-মুখ শক্ত করেই রিকশার হুড ধরে বসে থাকতাম বাসায় না ফেরা পর্যন্ত। মাঝে মাঝে স্যারের বাসায় পড়তে যেতাম এ গলি-সে গলি পার হয়ে। তখন বেশিরভাগ সময় হেঁটেই যাতায়াত করতাম। কোনো ফাঁকা রাস্তার মোড় ঘুরতেই দেখতাম একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাকে দেখে তার লুঙ্গি উঁচু করে নিম্নাঙ্গ দেখাচ্ছে। অনেক সময় কয়েকজন মেয়ে একত্রে থাকা অবস্থায়ও এই ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আশির দশকে ঢাকা শহরের বাড়িগুলোতে অনেকটা মফস্বলের মতো আবহাওয়া থাকত। গ্রাম থেকে অনেকে শহরে ডাক্তার দেখাতে বা নানা দাপ্তরিক কাজে আসত। তখন তারা আমাদের ঢাকার বাসায় উঠত। এই দূর-সম্পর্কের পুরুষ আত্মীয়দের অনেকেই আমার সাথে গল্প করত এবং বাসা ফাঁকা থাকলে পিঠ, হাত, পা স্পর্শ করত কথা বলার সময়। বিষয়টাকে তারা এমনভাবে ঘটাত যেন স্নেহবশে মাথায় বা কাঁধে স্পর্শ করছে। কিন্তু আমি ঠিকই অনুভব করতে পারতাম এটা স্নেহের স্পর্শ নয়। অল্পবয়সী কিশোরী মেয়েরা বাড়িতে আগত আত্মীয়দের এ ধরনের আচরণের কথা কারো সাথে বলতে ভয় পেত। আমিও কিছুটা লজ্জাবশত এ বিষয়গুলো কাউকে বলতাম না। বন্ধুদেরও বলতাম না। এভাবে দিনের পর দিন রাস্তায়, বাসায় একজন কিশোরী মেয়ে বিপরীত লিঙ্গের স্পর্শের বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

**প্রিয়জন যখন বদলে যায়**

বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে চাচা, মামা, খালু এবং চাচাত-মামাত-খালাত-ফুপাত ভাই-বোন– এসব সম্পর্ককে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে চর্চা করা হয় যে এসব সম্পর্কের ভিত্তি খুব মজবুত থাকে। এই সম্পর্কগুলোর মধ্যেও যে নানারকম যৌন হয়রানি ও নিপীড়নমূলক অভিজ্ঞতা ঘটতে পারে সে ব্যাপারে আমরা তেমন একটা সচেতন নই। আমাদের বাবার বন্ধু, মায়ের বন্ধুরাও সহজে অতি আপনজন হয়ে ওঠেন। আমার কলেজে পড়ার সময়ে আমরা রায়েরবাজার টালি অফিস রোডে একটি পাঁচতলা বাড়ির নিচতলায় ভাড়া থাকতাম। ওই বাসার দুটো গলি পরেই আমাদের পরিবারের একজন অতিপ্রিয় ব্যক্তি বাসা ভাড়া নেন। ওনাকে আমরা চাচা ডাকতাম এবং তিনি ছিলেন একটি বাম দলের নেতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি গ্রেনেড তাঁর গালের মাংস উড়িয়ে নিয়ে যায়। তিনি সে ক্ষতচিহ্ন সব সময় তাঁর শরীরে বহন করতেন। আমাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্য এমনকি আমাদের অন্যান্য আত্মীয়, বন্ধুরাও ওই চাচার অমায়িক এবং প্রাণখোলা আচরণে মুগ্ধ ছিলেন। একবার গল্প শুরু করলে রাত বারোটা পর্যন্ত তা চলত। আমরা প্রায়ই বিকালে চাচার বাসায় বেড়াতে যেতাম, রাতে খাবার খেতাম। যাই হোক, চাচার দুই

ছেলে ও দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর ঘরে একটি মেয়েও ছিল। তাদের সবাই আমাদের বাসায় যাতায়াত করত। দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সাথে তাঁর ওঠাবসা ও বন্ধুত্ব ছিল। ওনার দেশের বাড়িও মাদারীপুর।

আমি মাদারীপুর যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। তখন চাচা বলল যে উনি মাদারীপুরে যাচ্ছেন দু-একদিনের মধ্যেই। আমি চাইলে আনায়াসে তাঁর সাথে যেতে পারি। উনি আমাকে মাদারীপুর শহরে নানাবাড়ি পৌঁছে দেবেন। খুব উত্তেজনা নিয়ে মহা আনন্দে চাচার সঙ্গে নানাবাড়ি যাত্রা করলাম। আমরা গাবতলী থেকে চন্দ্রা নামের বাসে করে মাদারীপুর গেলাম। পথে যেতে যেতে চাচা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘটনা বললেন, যুদ্ধের সময়ের স্মৃতিগুলো বললেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা যে কত অকুতোভয় হতে পারেন সেসব বর্ণনা শুনছিলাম চাচার মুখে। তাঁর নিজের জীবনের সব উজ্জ্বল ইতিহাস। প্রথমে চাচা আমাকে নিয়ে টেকেরহাটে তাঁর একটি ছোট বাড়ি আছে সেখানে যান। একজন ছেলে সেখানে নানারকম ফুটফরমাস খাটছিল। তাকে খাবার দিতে বলে চাচা বললেন তুমি গোসল করবে? আমি রাজি হয়ে গেলাম। ব্যাগ নিয়ে ভেতরের ঘরে গেলাম ও দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে চাচা এসে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন। আমি বললাম, চাচা একটু পরে খুলছি। তিনি ক্রমাগত দরজা ধাক্কাতে লাগলেন। কোনোমতে কাপড় বদলে দরজা খুলে দিলাম। চাচা বললেন দরজা বন্ধ করছো কেন? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না। উনি খাটে আমার পাশে এসে বসলেন এবং একটু একটু করে আমার কাছাকাছি বসে, আমার সারা শরীর স্পর্শ করার চেষ্টা করলেন। আমি উঠে দরজার দিকে যেতে গেলে তিনি আবার স্বাভাবিক হয়ে বললেন, তুমি এমন করছো কেন? একটু পরেই খাবার দেওয়া হবে। এটা বলে তিনি আমার স্তনে হাত রাখার চেষ্টা করেন। আমি দাঁড়িয়ে বলি, চাচা আমাকে নানাবাড়ি দিয়ে আসেন। কেন, এখুনি যাবে কেন? বললাম, আমার ভালো লাগছে না এখানে। চাচা আমাকে জোর করে আদর করতে গেলে আমি জোরে তাঁকে একটা ধাক্কা দিই। তিনি মাটিতে পড়ে যান। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ঘটনার আকস্মিকতায় এতটাই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ি যে আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবার মতো মানসিক স্থিরতা ছিল না। চাচা পরিস্থিতি সামাল দিতে আমাকে ভাত খেতে বলেন। আমি কিছুই খাই না। ওনার খাওয়া শেষ হলে বলেন, আজ তো তিনি যেতে পারবেন না। আর কেউ নেইও, কাল সকালে যেতে হবে। রাতের সম্ভাব্য বিভীষিকার কথা চিন্তা করে বলি, আমি একাই যেতে পারব। চাচা বলেন, তুমি একা গেলে তোমার আব্বা-আম্মা রাগ করবেন। আমি মনে মনে বলি, আর আপনি আমাদের এত প্রিয়জন হয়ে আজ যা করলেন তা শুনলে তারা রাগ করবে না? যাই হোক, একরকম জোর করেই আমি টেকেরহাট থেকে মাদারীপুরের বাসে উঠি। উনি আমার ব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলেন। ওনার সহকারী ছেলেটি ব্যাগটা এনে দিয়ে বলে, আমি আপনার সঙ্গে যাব? আমি 'না' বলি এবং প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ ও বিষণ্ন মন নিয়ে মোস্তফাপুর পার হয়ে মাদারীপুর শহরে বাসস্ট্যান্ডে এসে নামি।

ওই বয়সে কখনো একা বাস জার্নি করি নি, বিশেষ করে ঢাকার বাইরে তো নয়ই। তবে আমি যখন একা একা মফস্বলের ভিড়ভর্তি বাসে যাচ্ছিলাম মনের মধ্যে কেমন একটা মুক্তির আনন্দ

বয়ে যাচ্ছিল। খুব ভালো লাগছিল। ওইদিন এটাও অনুভব করি যে, জীবনে সব সময় একাই পথ চলতে হবে। যাদের আপনজন বলে জানব তারা মুহূর্তে বদলে যেতে পারে। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাব না কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস রাখবারও কোনো অবকাশ নেই।

এটা তো ছিল খুব মোটাদাগের ঘটনা। এর পরেও জীবনে বহুবার মানসিকভাবে প্রতারণার সম্মুখীন হয়েছি, যা ওই মুহূর্তে মনকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। কিন্তু সেটা সামলে নেওয়ার পর বুঝতে পেরেছি কেউ যখন কাউকে মানসিক বা শারীরিকভাবে হয়রানি করে বা আঘাত করে, সেটা তাদের জন্য খুব স্বাভাবিক ঘটনা। তাদের মানসিক গঠন এমন থাকে যাতে তারা অন্যের মনে, শরীরে কী প্রতিক্রিয়া ঘটছে তা অনুভব করতে পারে না। এজন্য তাদের খ্রিষ্টীয় কায়দায় ক্ষমা করে দেওয়ারও কিছু নেই। তবে তারা যে সমাজ-সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে, তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তাদের আচরণে। সেজন্য শৈশব-কৈশোরে পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌনতার বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা কথাবার্তা হওয়া দরকার। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করলে পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। একে অপরকে বোঝার বিষয়টা সহজ হয়। পরিবারের সদস্যরা এবং শিক্ষকরা তাদের সাহায্য করতে পারেন। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো নারী-পুরুষ উভয়কে মানুষ ভাবতে শেখা। নারী-পুরুষের মধ্যে অবশ্যই লিঙ্গীয় এবং যৌন পার্থক্য আছে কিন্তু সব সময় সব ক্ষেত্রে এ ভিন্নতাকে মাথায় নিয়ে চলার অনুশীলন বন্ধ করতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক পরিবেশে এমনকি পরিবারের মধ্যেও নারী-পুরুষকে সমদৃষ্টিতে দেখার চোখ তৈরি হওয়া দরকার। এটা এমন না যে খুব সহজ এবং বললেই হয়ে যাবে। কারণ হাজার হাজার বছর ধরে ভিন্নতা, অন্যতার যে ঘেটো তৈরি হয়েছে তা স্বল্প সময়ে পরিবর্তিত হওয়ার কথা নয়। আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি এবং সেটা সাধারণভাবে নয়। মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশু মনস্তাত্ত্বিক, ছাত্র, লেখকসহ সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের যৌথ ভাবনা-বিনিময়ের দ্বারা এ পাঠ্য তৈরি করতে হবে, যার নাম হতে পারে সমতার শিক্ষা। তবে এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মতো দেশে খুব কম সংখ্যক শিশু প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। যারা স্কুলে যায় না তাদের জন্য সরকারি পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে এ জ্ঞান বিতরণ করতে হবে। তা ছাড়া এ শিক্ষা বা জ্ঞানের বিনিময় শুধু বিদ্যালয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব ক্ষেত্রেই একটা বাধ্যতামূলক বিষয় থাকবে লিঙ্গীয় ও যৌনতা সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা। একে লজ্জা পেয়ে এড়িয়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে এ শিক্ষা গ্রহণ করার মনোভাব প্রথমেই দূর করতে হবে। ধর্মীয় বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি স্থায়ী সমাধান করে এ বিষয়ে কাজ করতে হবে, যাতে করে যৌনতা সম্পর্কিত জ্ঞানকে কেউ ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক ভাবতে না পারে।

## তিতুমীর হল, ইলিসিয়াম ভবন, গাউছিয়া মার্কেট ও কিছু কথা

১৯৮৮ সালের ঘটনা। তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। একদল তরুণ প্রতিভাবান কবির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সে সময় গাদা গাদা ভারতীয় উপন্যাস, রাশিয়ান গল্প শেষ করে বাংলা ভাষার কবিদের কবিতা পড়া শুরু করেছি মনোযোগ দিয়ে। হঠাৎ একদল তরুণ তুর্কি কবির দেখা পেয়ে ওই বয়সে আমি যারপরনাই আনন্দিত। শুরু করলাম লিটল ম্যাগাজিনে ভ্রমণ। গাণ্ডীব, পেঁচা, অনিন্দ্য, কলকাতার সুবিমল মিশ্রর ভাইটো পাঠার ইসটু, সোনার গান্ধী মূর্তি, নতুন নতুন দর্শন আর লেখার সঙ্গে পরিচয়। ওই তরুণ বন্ধুরা 'নদী' নামে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করত। নিতান্ত অল্পবয়স বলে ওদের সঙ্গে সময় কাটাতাম মূলত আড্ডার উদ্দেশ্যে। তবে ভালোলাগার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ, বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটতে লাগল। ওইসব বন্ধুদের প্রতি আমি এতটাই অনুরক্ত হয়ে পড়লাম যে ওদের অনুপস্থিতি আমাকে খুব বিষণ্ন করে তুলত। দীর্ঘদিন বন্ধুদের কোনো খবর না পেয়ে একদিন বুয়েটের তিতুমীর হলে চলে গেলাম। ওই প্রথম আমার এতটা পথ একা চলা ঢাকা শহরে। তিতুমীর হলে এক বন্ধু থাকত, সে স্থাপত্যের ছাত্র ছিল। সমবয়সী না হলেও তাদের সঙ্গে সখ্যতার ঘাটতি ছিল না। যাই হোক হলের গেটে গেলে দারোয়ান বলল, বুয়েট বন্ধ, হলে ছাত্ররা নেই এবং আমার বন্ধুটিও নেই। সে তার দেশের বাড়িতে গেছে। এই খবরটি শোনার পর আমার মন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল।

রায়েরবাজার থেকে এত দূরে এসে বন্ধুকে না পেয়ে খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়ি। বেশ হতাশাগ্রস্ত লাগতে থাকে। কিছুক্ষণ তিতুমীর হলের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করি। ভাবতে থাকি কী করা যায়। এভাবে বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো আমাদের ওই তরুণ বন্ধুদের মধ্যে আরেকজন গোপীবাগে ইলিশিয়াম ভবনের আটতলায় থাকে তার বড় ভাইয়ের বাসায়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি ওখানে যাব। যদিও ওদিককার পথঘাট কিছুই চিনি না। রিকশা নেওয়ার জন্য হলের সামনে দাঁড়াই। বেশ কয়েকটা রিকশা চলে যায়, কিন্তু সব যাত্রীতে ভরা। হঠাৎ একটা খালি রিকশা এগিয়ে আসতেই আমি হাত দিয়ে ডাকি এবং জানতে চাই সে টিকাটুলি ইলিশিয়াম ভবনে যাবে কি না। যাবে বলতেই রিকশায় লাফ দিয়ে উঠতে যাই। তখন আমার পাশে অপেক্ষমাণ আরেকটি ছেলে রিকশায় ওঠার চেষ্টা করে। আমি বলি, এই রিকশা তো আমি ডেকেছি, আপনি কেন উঠছেন? ছেলেটি হেসে বলে আমিও তো ওকে ডাকলাম। দুজনে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর ছেলেটি বলে আপনার বন্ধুকে আমি চিনি। হলে আমাদের বন্ধু, দেশে গেছে। তার কথা শুনে স্বস্তি হয়। ছেলেটি বলে, আমি অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছি আপনি উদভ্রান্তের মতো ঘুরছেন। এই এলাকা ভালো না। আমি তাকে বলি, আপনি চাইলে রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারেন। আমি অন্য একটা খুঁজে নেব। ছেলেটি তখন খুব বিনয়ী হয়ে বলে, না না আপনি যান। তবে চাইলে আমাকে লিফট দিতে পারেন, আমি সামনে নেমে যাব। কী একটা জায়গার নাম বলল, এখন মনে নেই। আমি কিছু না ভেবেই আমার বন্ধুর পরিচিত, বুয়েটের ছাত্র হিসেবে তাকে আমার সঙ্গে রিকশায় যাওয়ার জন্য বলি। ওই বয়সে এ ধরনের অপরিচিত একজনকে রিকশায় উঠতে বলাটা বোকামি হলেও

আমি সহজ-সরল মনে তাকে সহযাত্রী হিসেবে নিয়ে যাই। তা ছাড়া ছেলেটি আমার বন্ধুর পরিচিত। কিছুটা এগোলে ছেলেটি আমার পেছনে হাত রাখার চেষ্টা করে। আমি কিছুটা সংকুচিত হয়ে বসি। আমি যতটা চেপে বসি ছেলেটি ততটাই আমার গায়ের সঙ্গে চেপে বসার চেষ্টা করে এবং তার শরীর দিয়ে আমাকে চাপ দিতে থাকে।

ছেলেটি রিকশায় উঠেই আমি কোথায় যাব জানতে চায়। আমি বলি টিকাটুলি ইলিশিয়াম ভবনে। এ ছাড়াও আমার বাসা কোথায়, কোন স্কুলে পড়ি, এসবও জানতে চায়। সব সত্য কথাই তাকে বলি। যাই হোক রিকশায় সে হুড উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে আমি বাধা দিই এবং রিকশাওয়ালাকে দ্রুত যেতে বলি। কিন্তু একটা পর্যায়ে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং সচিবালয়ের সামনে পৌঁছালে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়ি। ছেলেটিও রিকশা থেকে নেমে পড়ে। আমি বলি আমার মামার অফিস, এখানে কাজ আছে। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দেওয়ার চেষ্টা করি। ছেলেটি খুব চটপট বলে দেয়, না না আপনার রিকশা নিয়ে আপনি যান, আমি যাব না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ছেলেটি দ্রুত ফুটপাতে উঠে পড়ে।

রিকশায় আবার উঠি এবং অভিসার সিনেমা হল পেরিয়ে টিকাটুলিতে ইলিশিয়াম ভবন খুঁজে পাই। পথ চেনা না হওয়াতে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে বন্ধুর ঠিকানায় পৌঁছাই। ততক্ষণে মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। এমনিতে বাসা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। তার উপর এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো। নিজের প্রতি কিছুটা রাগ হচ্ছিল। কেন একজন অপরিচিত ছেলেকে রিকশায় উঠতে দিলাম। যাই হোক, ইলিশিয়াম ভবনে পৌঁছে মনের সব বিধ্বস্ততা কাটিয়ে উঠলাম। অন্তত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবে বেশ আনন্দ লাগছিল। ইলিশিয়াম ভবনের আটতলায় বন্ধুটি থাকে তার ভাইয়ের ফ্ল্যাটে। দারোয়ান বলল, লিফট চলছে না বা কারেন্ট নেই এরকম কিছু, ঠিক মনে পড়ছে না। আটতলা বেয়ে উঠে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আটতলায় বেশ কয়েকটা দরজা অর্থাৎ অনেকগুলো ফ্ল্যাট। বন্ধুর বাসার ফ্ল্যাট নম্বরে অনেকক্ষণ কলিংবেল বাজালাম, দরজা ধাক্কালাম, কেউ খুলছিল না। বেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর মনে হলো ফ্ল্যাট নম্বর ভুল হয় নি তো! তাই অন্যান্য ফ্ল্যাটে নক করে বন্ধুর নাম বললাম। ওরা বলল, আমি যে নম্বরে নক করছি ওটাই ঠিক। কিন্তু হয়ত তারা বাসায় নেই। এতক্ষণে মনে হলো এটাই তো হতে পারে। আমি আসব একথা তো বন্ধুর জানার কথা না। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে চাইলাম। সিঁড়িতে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। এক সময় আমাদের দুজন বন্ধুর গলা শুনলাম। ওরা আমাকে এভাবে সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখে অবাক হলো। তারপর সব বৃত্তান্ত শুনে বাসায় নিয়ে গেল। বাসায় ওর ভাই ছিল কিন্তু দরজা খুলছিল না কেন সেটা বুঝলাম না।

কিছু সময় ওই বাসায় কাটিয়ে তিনজন মতিঝিল এলাকায় গেলাম। আমার বন্ধুরা একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করত। ওই ম্যাগাজিনের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য মতিঝিলের বেশ কয়েকটা অফিসে গেলাম। বন্ধুটি বলল মেয়েরা থাকলে এইসব কাজে সুবিধা হয়। ভাবছিলাম মেয়েরা থাকলে সুবিধা হয় এটা কেন আমার বন্ধু ভাবল এবং

আমাকে বলল? বেশ অপমান বোধ হলো। বন্ধুটি আমার হাতে কয়েকটা আলপিন দিয়ে বলল, মতিঝিল এলাকায় খুব ভিড়। ভিড়ের মধ্যে বেসামাল হাত বুক বা নিতম্ব স্পর্শ করতে পারে। ওই সময় একটা আলপিন ওই লোকের শরীরে বিঁধিয়ে দিতে পারলে মোক্ষম হবে। ওদের অভিনব চিন্তা আমাকে অবাক করল।

যাই হোক, অনেক প্যাঁচিয়ে-ঘুরিয়ে মতিঝিলের ফুটপাত থেকে বেরোলাম। ওইদিন তেমন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও ঢাকা শহরে ভিড়ের রাস্তায় বহুবার বহু অনাকাঙ্ক্ষিত হাতের স্পর্শের অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা খুব কষ্টকর ছিল। ওইদিন তিন বন্ধু মিলে ওসমানী উদ্যানে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে গেলাম। বইপত্র দেখে বিকালের পড়ন্ত রোদে উদ্যানের সবুজ ঘাসে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। ফেরার পথে আমার বন্ধুটি শাহবাগে নেমে গেল।

গাউছিয়া মার্কেট আর নিউমার্কেট সত্তর-আশির দশকে ঢাকা শহরের প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। তখনকার সময়ে ঢাকার মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষেরা এ দুটো মার্কেট থেকে পোশাক, আসবাব, অলঙ্কার এবং কাঁচা-বাজারসহ সব ধরনের কেনাকাটা করত। আশির দশকে আমাদের পরিবার রায়েরবাজার, ধানমণ্ডি পনেরো নম্বর– এ সমস্ত এলাকায় বসবাস করত। ওইসব এলাকা থেকে নিউমার্কেট তখন খুব কাছে ছিল। কেননা রাস্তায় গাড়িঘোড়া, যানবাহন কম চলাচল করত, যানজট ছিল না। কিন্তু গাউছিয়া মার্কেটে অসম্ভব ভিড় ছিল। বিশেষ করে ওভারব্রিজের নিচের জায়গাটায় এবং চাঁদনী চকে। ওভারব্রিজের নিচের জায়গাটা পার হতে গেলে ভিড়ের চাপে একপাশ থেকে আরেক পাশে চলে আসতাম। আর ওই সময় অসংখ্য পুরুষ হাত শরীরের বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করতে চেষ্টা করত। ভিড়টা এমন পর্যায়ের থাকত যে ওই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসার উপায় থাকত না। ওই ভিড় এড়াতে অনেক সময়ই আমি বড় রাস্তা দিয়ে অনেকটা ঘুরে গাউছিয়া মার্কেটের পেছনের দিক দিয়ে ঢুকতাম। জায়গাটা একটা গুহার মতো ছিল। ঢুকে পড়লে তাল হারিয়ে ফেলতে হতো। আমার মা ও ছোট বোনসহ যেতাম মার্কেটে। ওই ভিড়ের কারণে গাউছিয়াতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

আমার ধারণা ২০০৪-'০৫ সাল থেকে গাউছিয়া ও নিউমার্কেটে যারা যেত এবং এখনো যায় তারা সকলেই এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। ছেলেরাও এই ভিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেত। তবে মেয়েদের অভিজ্ঞতা ছিল যৌন হয়রানিমূলক। বিষয়টা এমন যে ঢাকা শহরে কোথাও একটা ভিড় মানেই এই ধরনের অভিজ্ঞতা। অনেক বিকৃত রুচির পুরুষ এই ধরনের ভিড়ের জন্য অপেক্ষা করত। এদের কোনোদিন কোনো শাস্তি হয় নি। একমাত্র ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড ঘটলে দু-চারজন ব্যক্তি প্রথাগত আইনের অধীনে দণ্ড পেয়ে থাকে। এসব ঘটনায় মেয়েরা সরাসরি আক্রমণকারীকে ধরতে পারলে দু-একটা চড়-থাপ্পড় দিয়ে দেয় এবং মৌখিকভাবে নানা কথা বলা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় না এ ধরনের মানসিকতার ব্যক্তির দু-চারটা চড়-থাপ্পড় বা বকাবকিতে কোনো বোধোদয় হয়। তারা সামান্য লজ্জা পেয়ে ওই স্থান থেকে সরে পড়ে মাত্র।

## ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রমণ ও কিছু কথা

১৯৯২ সালের শেষের দিকে তখন উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছি। নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ফরম কিনছি, ডাকে জমা দিচ্ছি। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম জমা দেওয়ার জন্য ভাবলাম ময়মনসিংহ যাই। কখনো যাওয়া হয় নি। আমাদের বাসার পাশেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র থাকতেন। ওনাদের পরিবারের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। পরিবারের সব ছেলেমেয়েই একটি বাম সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু নিজেও একই ধরনের চিন্তা-ভাবনা করতাম, সে কারণে তাদের সঙ্গে চিন্তার বিনিময়টা সহজ হতো। ওই পরিবারের এক ছেলে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে পড়ত। সেই সূত্রেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেটি আমাকে বলল, তুমি তো আমার সঙ্গে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারো ফরম জমা দিতে। আমি তো খুশিতে আত্মহারা। আসলে ঠিক একা যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছিল না, আবার যেতেও চাইছিলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইটি সঙ্গে যেতে চাওয়ায় বেশ স্বস্তি বোধ করলাম। এ ছাড়া ওখানে ওনার বড় ভাই ও সংগঠনের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব সেটাও বেশ ভালো লাগছিল। বাসা থেকে বেবিট্যাক্সিতে মহাখালী বাসস্ট্যান্ডে গেলাম। তারপর মহাখালী বাসস্ট্যান্ড থেকে টিকিট কেটে ময়মনসিংহে যাত্রা। পথে যেতে যেতে বড় ভাইটি ওনাদের পার্টি সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। পার্টির আদর্শ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ নানাকিছু। আমারও কিছু কিছু জানা ছিল এবং কথা বলতে বলতে ময়মনসিংহে পৌঁছে গেলাম। বাসস্ট্যান্ড থেকে অন্য একটি যানবাহনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের পৌঁছাতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করল। নানাদিকে ঘুরে ফরম জমা দিয়ে ওই সময়ের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম নেতাদের সঙ্গে পরিচয় হলো। ওনারা বললেন, তুমি এখানে ভর্তি হও, আমাদের সঙ্গে অনেক কাজ করতে পারবে। এইসব কথাবার্তার পর সঙ্গী ভাইটির ডাক্তারি পড়ুয়া বড় ভাইয়ের মেসে গেলাম। ওখানেও বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে পরিচয় হলো।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া করতে করতে বিকেল হয়ে গেল। ঢাকায় ফিরতে হবে তাই দ্রুত রওনা হলাম। ফেরার পথে সঙ্গী ভাইটি বাসে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে চেষ্টা করলেন। আমি একটু সরে সরে বসছিলাম। যতই জানালার দিকে সরছিলাম উনি আরো চেপে আসছিলেন। বলা যায় একরকম গায়ের উপর চড়ে বসতে চেষ্টা করছিলেন। আমার খুব অস্বস্তি হতে থাকে এবং মন খারাপ হয়। একজন ছেলের সঙ্গে একজন মেয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ঘুরে বেড়ানো মানেই তার সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে যাবে এটা কেমন মানসিকতা! ছেলে ও মেয়েরা কি একসঙ্গে চলাফেরা, কাজকর্ম করবে না? উভয়ের সম্মতিতে ঘনিষ্ঠতা হতেই পারে অথবা কোনো আবেগতাড়িত সম্পর্কের সূচনা থেকে অনেক কিছুই ঘটতে পারে কিন্তু সেসব কিছু তো নয়। শুধু নির্মল বন্ধুত্ব এবং একা পেয়ে সঙ্গী ভাইটির আচরণ মুহূর্তে বদলে গেল। বাস থেকে নেমে সিএনজিতে করে বাসায় ফেরার পথে উনি আবারও একই আচরণ করতে লাগলেন। আমি বেশ আহত হলাম এবং বললাম, প্লিজ আমাদের মধ্যে যে সম্মানসূচক সম্পর্কটি আছে তা যেন নষ্ট না

হয়। এমন কিছু করবেন না যা দুজনের বন্ধুত্বকে নষ্ট করে দিতে পারে। যাই হোক, সারাপথ ওনার নানারকম দৈহিক আচরণ সহ্য করে বাসায় ফিরে এলাম।

বিষয়গুলো এমনভাবে এবং এমন ব্যক্তিদের দ্বারা ঘটে যারা খুব বিশ্বস্ত বন্ধু, আপনজন, প্রতিবেশী। যাদের সঙ্গে আমরা খোলামেলাভাবে বন্ধুর মতো মেলামেশা করি। কখনো ভাবি না মুহূর্তে সে বদলে যেতে পারে। সে কারণে এ ঘটনাগুলো ঘটার সময় প্রতিক্রিয়া জানাতে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হয়। সরাসরি তাদের আচরণ নিয়ে বলাটা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্য কাউকে এ বিষয়ে বলাটাও অস্বস্তিকর। বিশেষ করে অল্পবয়সী তরুণী মেয়েরা এ ধরনের অভিজ্ঞতার পর প্রথমেই মুষড়ে পড়ে। যার সম্পর্কে এ ধরনের কিছু ভাবতে পারে না তার কাছ থেকেই অভিজ্ঞতার সূচনা হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রমণ এবং এ সম্পর্কিত সুন্দর স্মৃতিটুকু মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন ধরে এ ঘটনার ভার বহন করতে হয়। একজন প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, নারী প্রগতিতে বিশ্বাসী বয়োজ্যেষ্ঠ কারো কাছ থেকে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা আমাদের চলার পথকে অনেক সময় সংকুচিত করে দেয়। বারবার মনে হতে থাকে, আশেপাশে আরো যারা রয়েছেন তারাও কি একই আচরণ করবেন? দুঃখের বিষয় যে এরকম একটা ঘটনা ভুলবার আগেই এর চেয়েও কোনো ঘনিষ্ঠজনের কাছ থেকে এমন ধরনের যৌন আক্রমণাত্মক অভিজ্ঞতা হয়, যা পূর্বের ঘটনাকে ম্লান করে দেয়। সেই সঙ্গে আরো কিছু নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে তোলে।

**থার্টিফার্স্ট নাইটের কথা**

১৯৯৬ সাল। তখন এমন এক তুমুল সময় চলছিল যে, মন ও মগজে করাতের একটানা শব্দ। জীবন চলছিল খোলা তলোয়ারের মতো। এখানে-ওখানে ছড়ানো ভাঙা কাচ। পায়ের নিচে পড়ে কখনো রক্তাক্ত করত, কখনো মাড়িয়ে যেতাম গোলাপের পাপড়ি। ভেতরে ভেতরে চলছিল কবিতার সংলাপ। প্রিয়জনের অকালপ্রয়াণে মন শতচ্ছিন্ন। বন্ধুরা ইংরেজি নববর্ষের শেষ দিনটিতে মিলিত হলো। আমাকেও নিমন্ত্রণ জানানো হলো। তখন মন এত ভারাক্রান্ত ছিল, কারো সঙ্গে একটা-দুটোর বেশি কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। কিছু না ভেবেই চলে গেলাম বন্ধুদের আয়োজনে। মনের কোণে হয়ত কিছু ভালোলাগা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। বন্ধুদের সঙ্গ আমি সব সময়ই পছন্দ করি, তারা যদি হয় কিছুটা শিল্প-সাহিত্য ঘনিষ্ঠ। জীবন যখন একদম শুকিয়ে আসে, তখনো এই বন্ধুদের কাছ থেকেই রসদ কুড়িয়ে নিই। আর লেখালেখি, পড়া এসব থেকেও। কবিতা, হ্যাঁ কবিতার পৃথিবী হয়ত মনকে দ্রুত বদলে দেয়।

আমাদের বাঙালিদের দেশে ইংরেজি ঘরানার বহু আচার-অনুষ্ঠান প্রবেশ করেছে বহুদিন ধরে। এক সময়ে ব্রিটিশদের অধীনে উপনিবেশ থাকার কারণে তাদের রুচি, ভালোলাগা, মন্দলাগা, অনুষ্ঠান, নানা দিবস, পোশাক-আশাক বাঙালিদের মধ্যে প্রবেশ করেছে কিছুটা সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে, কিছুটা চাপিয়ে দেওয়ার কারণে। রাজা-বাদশা বা দেশ পরিচালনাকারীদের মতামত মেনে নিতে হয় শাসিত জনগণকে। যাই হোক, তেমনি নানা দিবসের মতো থার্টিফার্স্ট নাইটও

আমাদের সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছে। তবে এই বিষয়গুলো প্রবেশ করেছে সমসাময়িককালে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ইংরেজ এবং আমেরিকানদের আধিপত্যশীল সাম্রাজ্যবাদের কারণে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো কিছু রাষ্ট্র ব্যতীত সর্বত্রই এই ইংরেজি সংস্কৃতির ছোঁয়া। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও এই বিদেশী সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। যাই হোক, থার্টিফার্স্ট নাইটের প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে এত কথা চলে এল।

সেটি ১৯৯৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। প্রথমে কলাবাগানে এক বন্ধুর বাসায় গেলাম। ওখানে আরো কয়েকজন বন্ধু এল। সবাই মিলে একজন স্থপতির বাসায় গেলাম, তার বাসাও কলাবাগানের আশেপাশেই ছিল। ওই স্থপতি আমাদের এক বন্ধুর বন্ধু। স্থপতি দম্পতি আমাদের অভ্যর্থনা জানাল তাদের ছোট ফ্ল্যাটটিতে। এক বন্ধু সেতার নিয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ সেতার বাদন শুনলাম। সবার বসার জন্য মেঝেতে তোষক বিছিয়ে বিছানা করা হলো। রাত বাড়তেই শুরু হলো আড্ডা, জলপান এবং খাওয়া-দাওয়া। যদিও ওই সময়ে আমি খুব একটা কথা বলতাম না তবু অন্যদের প্রলাপ, কথাবার্তা শুনতে ভালোই লাগছিল। বিষণ্নতা একটু কাটছিল। স্থপতি বেশ আধুনিক এবং চৌকষ। তার কথাবার্তা সবাইকে আকৃষ্ট করে রাখছিল।

প্রায় সারারাত ধরে আড্ডা, জলপান চলল। শেষরাতের দিকে সবাই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মেঝের বিছানাতেই যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। শীতের রাত, শীতবস্ত্র ততটা ছিল না। তাই দুই-তিনজনে কাঁথা-কম্বল ভাগ করে নিয়ে শুয়ে পড়ল। আমাদের বাঙালি রুচিতে এ ধরনের পশ্চিমা আচার-আচরণ হয়ত ততটা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু তরুণ সমাজ এ ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে নির্মল বন্ধুত্ব এবং ভালো বোঝাপড়া ছিল। রাত বাড়তে লাগল। যদিও বাইরের পরিবেশে আমার খুব একটা ঘুম আসে না, কিন্তু সেদিন বেশ ক্লান্ত লাগছিল এবং নানা কারণে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমার ডানপাশে শুয়েছিল এক মেয়ে বন্ধু আর বামপাশে স্থপতি। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন আমার শরীর স্পর্শ করল হাত দিয়ে। ফিরে দেখি স্থপতি উশখুশ করছে। এত পাশাপাশি সবাই শুয়ে আছে যে উঠে যাবার পথ পেলাম না। আবার মনে হলো, হয়ত ঘুমের মধ্যে ভুলে ওনার হাত এসে লেগেছে শরীরে। আবার কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হতেই আবারও ঘটল। এবার বুঝতে পারলাম স্থপতি তার হাত দিয়ে আমার শরীর স্পর্শ করছেন। ঝটকা দিয়ে ওনাকে সরিয়ে দিলাম। কাঠ হয়ে শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। পায়ে হঠাৎ ওনার পায়ের স্পর্শ। একদম ইলেকট্রিক শকের মতো। লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। কারো পায়ে পাড়া লেগে গেল। কিছুটা দৌড়ে বারান্দায় চলে গেলাম। মন খুব বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

মন ভালো করার জন্য বন্ধুদের আড্ডায় এলাম কিন্তু এখানে এসে এরকম একটা অভিজ্ঞতা হবে ভাবতেই পারি নি। হয়ত সামান্য একটা ঘটনা, উনি আমাকে হাত দিয়ে শরীরে স্পর্শ করেছেন। কিন্তু ঘটনার ব্যাপ্তির চেয়ে এর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। একজন পরিচিত বন্ধু মুহূর্তে বদলে যায়। কোনো সুযোগ পেলেই তার উপরের

মুখোশটি খুলে পড়ে। যারা এ ধরনের বিষয় ঘটায় তাদের মধ্যে এ ঘটনার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। যেন খুব স্বাভাবিক বিষয়। যে কাউকে যে কোনো পরিস্থিতিতে শারীরিকভাবে স্পর্শ করা যায়।

আমাদের এই আড্ডাটাকে অনেকে হয়ত সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখবেন। এর নৈতিক মানদণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু আমরা জানতাম আমরা সকলে বন্ধু এবং একত্রে সময় কাটানোর মতো মানসিক গঠন সকলের আছে। এখানে কেউ কাউকে পছন্দ করতে পারে, কোনো সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে পারে। কিন্তু একজনের অজ্ঞাতসারে তাকে শারীরিকভাবে স্পর্শ করা এবং নিজের যৌন চাহিদা মেটানোর চেষ্টা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দুজন মানুষ পাশাপাশি বসলেই তার মানে এই নয় যে, তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বা সম্পর্কিত। ওইদিন বন্ধুত্ব সম্পর্কে আমার নতুন ধরনের একটা অভিজ্ঞতা হয়।

ডিসেম্বরের শীতের ওই রাতে বারান্দায় একা বসেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। এর মধ্যে আমাদের আরো দুজন মেয়ে বন্ধু উঠে এসে আমার পাশে বসে এবং জানতে চায় কী হয়েছে। ওই সময় এতটা মন খারাপ হয়েছিল যে, ঘটনাটা ওদের বলি। ওরা শুনে বেশ চমকে ওঠে এবং আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ স্থপতিকে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করার কথা ভাবে না। আরো দুজন ছেলে বন্ধু এসে পাশে বসে। আমাকে স্বান্ত্বনা দেওয়ার অজুহাতে একজন আমার হাত ধরে বোঝাতে চায় ঘটনাটি ভুলে যাওয়ার জন্য। বন্ধুটি দীর্ঘক্ষণ হাত ধরে থাকে এবং তার স্পর্শও আমার কাছে ভিন্নরকম লাগে। সে আমার হাতে হাত বোলাতে থাকে। আমি হাতটি সরিয়ে নিই এবং বারান্দার অন্যপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বন্ধুটি বলে তুমি তো এখন একা আছো, তোমার কোনো সঙ্গী নেই, আমরা পরস্পর বন্ধু হতে পারি না? আমি বন্ধুটির আচরণে অবাক হয়ে যাই। যে আমার বন্ধুত্ব কামনা করছে সে এই বিষয়টা পর্যন্ত ভাবছে না যে ওই মুহূর্তে আমি কীরকম মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে আছি।

আমি চাইছিলাম ওই রাতের ঘটনাটি সম্পর্কে আমার বন্ধুরা জানুক এবং তারা স্থপতিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুক। একজন অতিথির সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করাটা কতটা সংগত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলুক। তা না করে আমার বন্ধুরা অন্য কিছু বলার চেষ্টা করেছে। এ থেকে বুঝলাম একজন মেয়েকে তার অজ্ঞাতসারে শারীরিকভাবে স্পর্শ করার মতো গুরুতর বিষয়টির গুরুত্ব তাদের কাছে নেই বললেই চলে। তারা একে ডাল-ভাতের মতো মনে করেছে। তা ছাড়া, বন্ধুর মান-মর্যাদা, মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তারা মোটেই চিন্তিত নয়। একদল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যখন মিলিত হয় আড্ডা বা অন্য কোনো সমাবেশে, সেখানে পরস্পরের প্রতি তাদের কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না– এই ঘটনা থেকে এটাই বুঝতে পারলাম। ওই ঘটনার পর থেকে আমি ধীরে ধীরে আমার ওইসব তথাকথিত প্রগতিশীল বন্ধুদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকি। চিন্তা ও কাজে তাদের সঙ্গে মিশবার ব্যাপারে আর কোনো উৎসাহ পাই না। শুনেছি ওই

স্থপতি এখন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছে এবং তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা করেছে এবং তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

অল্প বয়সেই আমি নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। নিজের কৌতূহলের কারণেই এটা ঘটেছে। ওই সময় একটা বিষয় আমি উপলব্ধি করি যে যারা নিজেদের প্রগতিশীল দাবি করে এবং সমাজে সেভাবে নিজেকে প্রচার করে তাদের চেয়ে সাধারণ মানুষ যারা নিজেদের কোনো প্রগতির ছাতার নিচে দলবদ্ধ মনে করে না তারা অনেক বেশি সংবেদনশীল এবং অন্যকে সম্মান দিতে জানে। তবে সবার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য নিশ্চয়ই এমন নয়।

নভেরা হোসেন কবি ও লেখক। noverahossain@gmail.com